Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লুৎফর রহমানের সাহিত্যচিন্তা

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ইসরাইল খান
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.8
Pages	145-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

লুৎফর রহমানের সাহিত্যচিন্তা

ইসরাইল খান

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) তাঁর সমকালীন মুসলমান সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর করায় প্রয়াসী ছিলেন। সৃজনশীল রচনার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন বহু সংখ্যক প্রবন্ধ। অনেক সমালোচকের মতে প্রবন্ধ-রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা মুক্তি পেয়েছে।

প্রকাশের কৌশল এবং চিন্তার মৌলিকতায় বিশিষ্ট তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা থেকে লুৎফর রহমানের সাহিত্য-চিন্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যের কাজ মানুষকে তার চারদিককার মন্দ-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা। তাঁর ভাষায়, '... যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, যাহা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাই সাহিত্য'।

পিএইচ ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) এবং তাঁর সমকালীন বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, মানবিক আচার-আচরণ, লোকাচার, হিতবাদ ইত্যাদি বিষয়ে লেখনী চালনা করে সমাজকে প্রগতি ও উন্নতির পথে অগ্রসর করাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের 'উদ্দেশ্য' ও 'প্রয়াসের' গুরুত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করতে না-পারলে লুৎফর রহমানের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য এবং তাঁর প্রতিভার মাত্রা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উন্নত রুচি-আদর্শ বিবর্জিত সমাজে মিশ্রভাষারীতির কাব্যের প্রভাবে অলৌকিক রূপকথাভিত্তিক ধর্মীয় কাহিনী, অতিমানবীয় অথবা দানবীয় কেরামতি, অবাস্তব মহত্ত্বকথা ইত্যাদিতে ভরপুর ছিল বাঙালির একাংশের সমাজ-মানস। বিস্রস্ত, বিক্ষিপ্ত ছিল ভোগ বিলাসে মত্ত উন্মত্ত নরনারীর জৈবিক আকাঙ্ক্ষার বিবরণ। এরপর আবার ওহাবী-আন্দোলনের প্রভাবে এবং পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুসলমানেরা ধর্ম-জীবনে প্রবেশ করে চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিলেন ব্যাপক বন্ধ্যাত্ব। এই অবস্থায় মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত "সাধারণ জীবনের পুঞ্জিভূত অজ্ঞতা, অন্ধতা ও কুসংস্কারের উপর সত্যের প্রখর কিরণপাত করিয়া" প্রয়োজন ছিল সত্য-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার। প্রয়োজন ছিল: "মনুষ্যত্বের দৈন্য, হীনতা ও শূন্যতাকে" লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং "ইসলামের একান্ত সত্য ও সুমহান আদর্শগুলিকে কোরান-হাদিস হইতে পরিস্কার প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে অতি উজ্জ্বলভাবে লোক-লোচন সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মুসলমানকে মানুষরূপে গড়িয়া" তোলা।[১] মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এই 'মানুষ' গড়ার মহান ব্রতে সংগ্রামী কারিগর ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩); সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬); বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২); সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১); কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯); মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬); এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১); ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮); কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০); আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮); আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪); কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬); মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৮৩); সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪); আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪); মুহম্মদ এনামুল হক

(১৯০৬-১৯৮২) প্রমুখ মনীষী মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি, অর্থাৎ সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু বাঙালি জাতির জ্ঞান-সাধনা, সংস্কৃতি-ভাবনা ও চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে সুষম অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। যদিও এই সকল মনীষীর সকলেরই সংস্কার-চিন্তা এবং সংস্কৃতি-ভাবনা আর বিপ্লবী-চেতনার মাত্রা একই স্তরের ছিল না। কারো কারো চিন্তা-ভাবনা কখনও পুষ্টিদান করেছে অপেক্ষাকৃত উৎকট মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যেবিশ্বাসী, প্রকটভাবে ধর্মীয় ভাবধারার লেখক মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮); মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০); শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪); গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪); বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩); মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬); মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪) প্রমুখের চিন্তাধারাকে। অবশ্য একথাও এখানে উল্লেখ্য যে এই সমস্ত ধর্মীয় ভাবধারার (পাকিস্তানবাদী লেখক বলাই সঙ্গত) লেখকদের মধ্যে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রথমোক্ত ধারার যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী ধারার লেখকদের রচনাবলি ও চিন্তাধারা দ্বারা। আসলে যার যার প্রত্যেকের স্বকীয় আদর্শগত ভাবনার মাপকাঠিতে সকলেই সমাজকল্যাণকে মুখ্য ভেবেছেন বলে কারো-কারো যুক্তি ও মুক্তির পথ-অন্বেষণ প্রয়াস মানবতাবাদী ও প্রাগ্রসর চিন্তার ধারক-বাহক বিপ্লবীদের ভাবনার সমমাত্রায় উন্নীত হয়েছে। এবং যেখানে এই রকম যুক্তির ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই এই সমস্ত লেখকেরা জনগণের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করে থাকেন। এঁদের মহত্ত্ব সেখানেই। সেজন্যই খণ্ডিত; এদিক থেকে অপ্রধান চিন্তাবিদ।

মুসলিম সমাজের প্রধান চিন্তাবিদদের অগ্রগণ্যদল *শিখা*-গোষ্ঠীর কথা ইতিহাসে বিলম্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবু, বিশেষ করে বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম এবং *শিখা* বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর লেখক-চিন্তক কর্মীবৃন্দ ইসলামকে ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত করার লক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা অনেক হেনস্থা ও অপমানিত, নির্যাতিত হয়েছিলেন—সে ইতিহাস আজকাল প্রায় সকলেই অবগত। কিন্তু মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর উন্নত চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মুসলিম সমাজের বৃহদাংশের কাছ থেকে কি নিষ্করুণ প্রতিদান পেয়েছিলেন—সে কথা অনেকেরই জানা নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে লুৎফর রহমান সাংগঠনিকভাবে *শিখা*-গোষ্ঠীর লেখক-সংগঠকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না-থাকলেও চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁদেরই কাছাকাছি ভাবনার সমগোত্রীয় উচ্চমানের একজন ভাবুক-চিন্তক। চিন্তার সময়গত বিবেচনায় মুক্তবুদ্ধির

আন্দোলনের পূর্বেই তিনি অভূতপূর্ব মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়ে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মুক্তবুদ্ধির লেখক-চিন্তকেরা যে-কারণে সমাজের থেকে উচ্ছ্বসিত উপযুক্ত মূল্য-মর্যাদা প্রতিদান পাননি—লুৎফর রহমানও সে-কারণেই অবহেলিত ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছেন।

পৃথিবীর কোনো দেশেই নতুন চিন্তার প্রবর্তকেরা সমকালে গৃহীত হননি, প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন সকলেই। বার্ট্রান্ড রাসেলও লিখেছেন :

> প্রত্যেক জেনারেশনই কেবল অতীতের নব প্রবর্তকদের প্রতিই সহনশীল। যাঁরা সমকালীন, তাঁরা একইভাবে নির্যাতিত। সমকালীনদের বেলায় সহনশীলতার নীতি অনুসৃত হয়েছে, এমন কথা প্রায় শোনা যায় না।[২]

একথায় বোঝা যায় নতুনের উদ্ভাবক ও প্রবর্তকদের আত্মপ্রকাশের প্রতিবন্ধকতা সবযুগে সকল দেশেই ছিল। কিন্তু ইউরোপের এবং বিশ্বের অপরাপর উন্নত দেশসমূহে নতুনের উদ্ভাবকেরা সমকালে প্রতিবন্ধকতা ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও, পরবর্তীকালে তাঁরা ব্যাপকভাবে আদৃত ও অনুশীলিত হয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্যে অতীতের নবপ্রবর্তকদের প্রতি সহনশীলতার কথা উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষেও দেখা যায়, রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ সমকালে বিতর্ক ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীকালে সমাজ তাঁদেরকে জাতির কল্যাণের স্মারকস্তম্ভরূপেই গ্রহণ বরণ করেছেন। নতুন নতুন মূল্যায়নে রামমোহন-বিদ্যাসাগর এখনও গবেষকদের নিকট নতুন সত্য ও তথ্যের আকর-উৎসরূপে বিবেচিত হচ্ছেন। বিরোধিতার সম্মুখীন কে না হয়েছেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সারা-জীবনই বিরোধিতাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাগ্রসর চিন্তার উন্নত, মহান লেখক-মনীষীরা সমকালে বিরোধিতা-শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, পরবর্তীকালেও তাঁরা সমভাবে অবহেলার স্বীকার হচ্ছেন।[৩]

লুৎফর রহমান সম্পর্কে এ-কথাটা মনে রাখতে হবে যে প্রতিদানের অপেক্ষা না-করেও মনের অকৃত্রিম সমাজ-হিতৈষণা থেকে যে-কজন লেখক ওহাবী-চেতনার উত্তরাধিকারী সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ রাজনীতির বিভ্রান্তিকর, খণ্ডিত ঐতিহ্যপন্থীদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করে "বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশকে বাংলার মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশে নতুন চেতনার" জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন যে কজন লেখক, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। সংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও তাঁদের চিন্তা ও কর্মে স্বাতন্ত্র্য ও খাঁটি দেশপ্রেম ছিলো। "কেমন করে যে তাঁরা ওহাবীদের পাশ কাটাতে

পেরেছিলেন" তা ভাবলে অবাক হতে হয়। "বাংলার আকাশে বাতাসে ইংরেজি সাহিত্যের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের যে-উদার মানবিক প্রভাব অনুভূত হচ্ছিল, আর স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় বাংলার জাগরণ যেভাবে উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার রূপ লাভ করেছিলো। [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৫৬ : ১৯৩-৯৪] তা থেকেই তাঁদের প্রেরণা লাভ হয়েছিলো। তবে উনিশ শতকের ওহাবী-চেতনা প্রভাবিত মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের দলটিই বড়ো এবং সক্রিয় ছিল বেশি। কিন্তু মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধির ধারক-বাহকেরা আধুনিক রাষ্ট্র, মনুষ্যত্বের মুক্তি ও উন্নতির উপায় সন্ধানে রত ছিলেন। এই ধারাতে পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ আমলের কয়েকজন লেখক-চিন্তক বুদ্ধিপ্রবণ মানবতাবাদী ধারায় চিন্তা-চর্চা করে সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।[৪]

এই মহান মুসলিম লেখকদের পূর্বসূরি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে *বাংলার জাগরণ* (১৯৫৬) গ্রন্থে লেখা হয়েছে :

> তাঁর নামকরা বই 'প্রকাশ' (১৯১৫), 'উন্নত জীবন' (১৯১৯), 'মহৎ জীবন' (১৯২৬), 'মানবজীবন' (১৯২৭) প্রভৃতি। তাঁর কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের চৈতালীর প্রভাব সুস্পষ্ট। উন্নত নৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীবন গঠনের উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। Smiles এর নীতি-উপদেশপূর্ণ লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার কিছু মিল আছে, কিন্তু তাঁর লেখায় জীবন-বোধ আরো তীক্ষ্ণ, সেজন্য সাহিত্যিক সম্পদ Smiles এর চাইতে বেশি [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৫৬ : ১৯৪]।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রবন্ধ ছাড়াও কথিকা, ছোটগল্প, শিশু-সাহিত্য, উপন্যাস এবং অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর পাঁচটি উপন্যাস *সরলা* (১৯১৮); *পথহারা* (১৯১৯); *রায়হান* (১৯১৯); *প্রীতি-উপহার* (১৯২৭) এবং *বাসর-উপহার* (১৯৩০)। *ছেলেদের মহত্ত্বকথা* (১৯২৮); ছেলেদের কারবালা (১৯৩১); রানী হেলেন (১৯৩৪) প্রভৃতি *শিশু-সাহিত্য* এবং অনুবাদিত লেখা *দুঃখের রাত্রি* ও *মঙ্গল-ভবিষ্যত* পাঠক আদৃত হয়েছিলো। তবে প্রবন্ধকার হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। মুহম্মদ এনামুল হক *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে লিখেছেন : 'তাঁর ন্যায় চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক মুসলিম বঙ্গে অধিক জন্মগ্রহণ করেননি [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৬৮: ৩২০]। উল্লিখিত পুস্তক সমূহ ছাড়াও *সত্যজীবন* (১৯৪০); *উচ্চজীবন* (১৯৬২); *মহাজীবন* (১৯৭৫); *ধর্মজীবন* (১৯৮১); *যুবকজীবন* (৩য় প্রকাশ ১৯৮৫) প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে তাঁর চিন্তারাজি বিধৃত রয়েছে, যা তাঁর "উন্নত মণীষার পরিচয় প্রদান" করে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা মুক্তি পেয়েছে। ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতায়, প্রকাশের কৌশল এবং চিন্তার মৌলিকতায় তাঁর প্রবন্ধাবলী বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে [আনিসুজ্জামান ১৯৬৪ : ৪২৭-২৮]।

দুই

শুদ্ধতাবাদী লেখক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান-এর রচনাবলিতে যে বিষয়সমূহ রূপলাভ করেছে—তাঁর মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মীয়, মানবীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষি, শারীরিক, জৈবিক-যৌন, বিচিত্র বিষয় ছাড়াও পিতৃ-মাতৃভক্তি, নারী-স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও সহাবস্থাননীতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রয়েছে। সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য আবশ্যকীয় প্রতিটি বিষয়েই তিনি বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তাঁর লেখা ও কথায় অনেকেই সন্তুষ্ট হননি, হবার কথাও নয়। তাঁর কথায় অনেক কটূ অথচ জীবনপ্রদ বক্তব্য আছে। ভাষা ও সাহিত্য চিন্তার প্রসঙ্গে বক্তব্য হচ্ছে: উনিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে সক্রিয় সাহিত্যকর্মীদের অধিকাংশই যেখানে 'উর্দু-বাংলা' কিংবা 'আরবী' ইত্যাদির বিতর্কে উর্দুর পক্ষে অথবা বাংলার সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয় জড়িত মতামত ব্যক্ত করেছেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সেক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে জোরালো ভাষায় 'বাংলা' ও মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সাধনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-চর্চার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষা ও সাহিত্য-চিন্তা পাঁচটি উপন্যাস, তিনটি শিশুপাঠ্যপুস্তক এবং আটটি প্রবন্ধ-গ্রন্থের এক বিরাট অংশ দখল করে আছে। কোনো কোনো উপন্যাসের *(রায়হান)* মূল পরিকল্পনাই ছিল এই বক্তব্য উচ্চকিত করে তোলার জন্য যে মাতৃভাষার মাধ্যমে পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভ ব্যতীত মানুষের মন উদার হয়না এবং আত্মনির্ভরশীল না-হলে সেসব জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত হয় না, এবং সেসব মানুষ দ্বারা সমাজের ক্ষতি বই লাভ হয় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে উপন্যাসগুলোতে একথাও তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন যে, 'জ্ঞানের দ্বারা মনের চাষ না-করতে পারলে ধর্ম পালনও হয় না।' আরবী বা উর্দুতে মিলাদ পড়লে লোকেরা কিছুই বুঝতে পারে না বলে *রায়হান* এর নায়ক বাংলায় মিলাদ পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। মনের নানা কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে জ্ঞানের চাষ না করলে জাতির মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না, এটা লুৎফর রহমানের রচনাবলির মূলসুর। তিনি 'জাতির উত্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে জাগা, চেতনা-সমৃদ্ধ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। "জাতিকে খাঁটি রকমের বড় ও ত্যাগী করতে হলে সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বড় ও ত্যাগী করতে হবে।" কিন্তু কি পদ্ধতিতে? পদ্ধতি হলো: "প্রত্যেক মানুষের ভিতর জ্ঞানের জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জন্মিয়ে দেয়া চাই।" কারণ-

মনুষ্যত্বলাভের পথ জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায়, সকল সময়ে আহার-স্নানের মত মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন। উন্নত, ত্যাগী, শক্তিশালী, প্রেমিক, সৎ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষ বিদ্যাহীন বা অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষের বা জাতিকে বড় হতে হলে সব সময়ই তাঁকে জ্ঞানের সেবা করতে হবে [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৬ : ৬]।

লেখক জ্ঞানার্জনের উপায় জেনেছেন সাহিত্য-চর্চাকে। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতির লেখক-সমাজ এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে জাতিকে উচ্চ ও উন্নত হতে সহায়তা করে থাকেন। সাহিত্যসেবকেরাই ক্ষুধাতুর, আর্ত, পীড়িত-বঞ্চিতদের জাগিয়ে তোলেন। তিনি লিখেছেন :

পল্লীর কৃষক, দূর অজ্ঞাত কুটিরের ভিখারী, জমিদারের ভৃত্য, সাহিত্যিকদের মন্ত্রে মহাপুরুষ হয়। লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিতজনেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যাঁরা অবহেলা করেন, তাঁরা বাঁচতে পারেন না।[৫]
...'নিজের ভিতরে যে শক্তি আছে তা জাগিয়ে তোল, তুমি ছোট হয়ে পড়ে থাকবেনা [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৬ . ১২]।

প্রতিভাবলে মানুষ অনেক অসাধারণ কাজ করে; কিন্তু প্রতিভা তো ধৈর্য ও শ্রম ছাড়া কিছু নয়! *উন্নতজীবন* গ্রন্থে মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার সম্পর্ক নির্ণয় করে লুৎফর রহমান লিখেছেন :

মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহিত্যে মানব সাধারণের কোনো কল্যাণ হয় না। দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করতে হবে। আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সার সংগ্রহ করতে হবে। নিজেদের যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যের শক্তিতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষ হতে পারে। মানুষের সকল বিপদের মীমাংসা সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৬ : ৯]।

যুবক জীবন গ্রন্থে 'সাহিত্যের সঙ্গে যোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী "আপন-আপন সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সমাজের জন্য দু'কলম লেখেন না।" বাঙালি মুসলমানের স্বভাব হলো—স্বদেশ, মাতৃভাষা, "জীবিত মনুষ্যসমাজ এবং পৃথিবীকে অস্বীকার করে চলা। ... আমরা যেন পরকালের মানুষ; যেন এ জগতের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব নেই। এতেই

আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে।" তিনি বলেছেন, এই বিশ্বসংসার ও এর বিরাট-বিপুল সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। জীবিত মানুষের এবং সমাজের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। "জীবিত মনুষ্যের নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা যদি যোগ না রাখি, তাহলে আমরা দুর্বল শক্তিহীন হবো—পদে পদে লাঞ্ছিত হবো।" আল্লার এবাদত পৃথিবীর কাজের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের মানুষের ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে 'এবাদত' করতে হবে। তাঁর মতে: "জীবিত জাতির প্রাণের চিন্তা আর ভাবধারা সাহিত্যে ব্যক্ত হয়" যেহেতু, সেহেতু সকলকে 'সাহিত্যের সঙ্গে যোগ' রক্ষা করে চলতে হবে। 'দেশের মাতৃভাষা, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত খবরের কাগজ ও বিভিন্ন মাসিকের সঙ্গে যোগ রাখা চাই—নইলে দেশের অন্তর্নিহিত আত্মার সঙ্গে একটা গভীর যোগ, আত্মীয়তা এবং পরিচয় হয় না [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৫ : ৫৭-৫৯]।

সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ-হিতৈষণার গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে *মহৎজীবন* গ্রন্থের 'কাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে :

> সাহিত্যের কাজ মানুষকে তার চারদিককার মন্দ-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা। তার মধ্যে সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাহ্য করে ন্যায়, সত্য ও আল্লাহকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দেওয়া [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৬ ক : ৫৩]।

অন্যত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, যাহা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলি মূল্যহীন অকেজো কাগজের স্তুপ নহে।[৬]

যে দেশের জীবন-প্রবাহ যতো জটিল হয়, সেদেশের সাহিত্যও ততো বৈচিত্র্যলাভ করে। কিন্তু আমাদের সমাজে ও জীবনেই যেন বৈচিত্র্যের বড়ো অভাব। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান *যুবক জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন :

> বিশেষ করে মুসলমানদের জীবন যেন একেবারেই একঘেয়ে—যেন সবাই মৃত। সজীব আত্মায় চিন্তা, বিচার, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম—যা মনুষ্য জীবনকে বিচিত্র করে, তা যেন মুসলমান সমাজে নাই। সুতরাং এই সমাজে ভাল কথা-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া খুবই কঠিন। তবুও এ-সমাজে দুঃখ-ব্যথার অন্ত নাই। সমাজকে সুখময়, শান্তিপূর্ণ, সম্পদশালী, সম্মানী করার সাধনা যেদিন সমাজে জাগবে, সেদিন থেকে সমাজে ভাল

সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া শুরু হবে। এই দিক দিয়ে মুসলমানদের এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির পথ (সম্মুখে) পড়ে আছে। যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়লে অভিনব সাহিত্য-প্রভাবে সমাজে নব-জীবনের সঞ্চার হবে, বিপুল কর্মসাধনা জাগবে, সমাজের জয়যাত্রা শুরু হবে [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৫ :]।

এই শুভদিনের সম্ভাবনায় লুৎফর রহমান বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি সন্দিহান ছিলেন কতোদিনে সেই নতুন যুগের সাহিত্য-স্রষ্টা আবির্ভূত হবেন, সে বিষয়ে। কারণ তিনি সাহিত্যসমাজের নিষ্প্রাণ-অবক্ষয় দেখেছিলেন এবং জাগবার আগ্রহ লক্ষ্য করেননি। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকা সম্পর্কে সমাজ এখনও অনবহিত। সাহিত্য-সাধনা এবং উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া সমাজ যে জাগতে পারে না, এই বোধ ও বিশ্বাসই জাগেনি আমাদের সমাজের প্রাণে ও মনে। তিনি লিখেছেন :

শিক্ষিত মাত্রেই আপন-আপন সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সমাজের জন্য দু'কলম লেখেন না। সাহিত্যক হওয়া তো দূরের কথা, যাঁরা লেখেন, তাঁদের প্রতি কোনো উৎসাহও নাই।

শিক্ষিত সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যথার্থই লিখেছিলেন, তাঁরা মনে করেন :

বাল্যকালে কিছুদিন কোরান পড়লে, ছাত্র জীবনে পাঠ্য-পুস্তকগুলি পড়ে শেষ করতে পারলেই জীবনের শিক্ষা পূর্ণ হলো। নতুন নতুন বই পড়বার আকাঙক্ষা সমাজে নাই। হিন্দু-সমাজের মেয়েরা যে-সব বই পড়ে, মুসলমান সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিরাও ততখানি বই পড়ে না। কি উন্নতি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আপন দেশ, মাতৃভাষা, জীবিত মনুষ্য সমাজ এবং পৃথিবীকে অস্বীকার করে চলাই আমাদের স্বভাব। ...., এই বিশ্ব-সংসারকে স্বীকার করতে হবে।—এর বিরাট বিপুল সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশতে হবে। .... জীবিত জাতির প্রাণের চিন্তা ও ভাবধারা সাহিত্যে ব্যক্ত হয়। সেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদিগকে যোগ রাখতে হবে—যদি আমরা জীবিত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। মৃতের কোন সাধনা নাই। ...
কবিতা পাঠ করলে এবং সঙ্গীত শ্রবণে মন পবিত্রভাবাপন্ন হয়, এ কারণে লোকে কবিকে সম্মান করে। অশ্লীল কবিতা, যাতে নারীর রূপ অশ্লীল ও তরলভাবে আলোচিত হয়, তা পাঠ করলে মন অপবিত্র হয়। খারাপ বই পড়লে কোন লাভ হয় না। বিজ্ঞানের

বই, উন্নত কবিতা, কাব্য, ভাল উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, উন্নত চিন্তা এসব নিত্য পাঠ করলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ হয়, দিন দিন মানুষ উন্নত হয়। ...

যে সমস্ত যুবকের সৎসাহিত্যের সঙ্গে সংশ্রব নেই, যারা অনুন্নত নিম্ন-সমাজে সদা মেশে, কথা বলে, আলাপ করে, ভদ্র সমাজে ওঠাবসা করে না—তাদের রুচি, চরিত্র, ব্যবহার দিন দিন জঘন্য ও কদর্য হতে থাকে [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৫ : ৬০]।

লেখক বাংলার জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন; এবং বাংলার জাগরণ অংশত হিন্দু-সমাজে ঘটলেও, মুসলমান-সমাজের জাগতে যে আরও বাকী আছে এবং এই জাগার, উন্নত হবার যে বিচিত্র অবকাশ এখনও রয়ে গেছে, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর পরাধীনতার গ্লানি তীব্র ছিল। তাই স্বাধীনতা ও জাগরণের প্রতি ব্যগ্রতা ছিল। 'জাতির উত্থান' তিনি কামনা করতেন কায়মনোবাক্যে। এবং সাহিত্যের মাধ্যমেই যে, 'জাগরণ' আসে (আসা সম্ভব), তা তিনি বহুভাবে ও বিচিত্র ভাষায় বলতে বুঝাতে ও চেয়েছেন। এই বোধ থেকেই তিনি ১৯২১ সনে উর্দু ও বাংলার বিতর্ক চলাকালে 'উর্দু ও বাঙ্গলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* 'বাংলা ভাষার মহিমা' প্রসঙ্গে আবেগ-কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন :

কত হাসি, কত ··· কণ্ঠস্বর যে ভাষার সহিত জড়াইয়া আছে তাহা কি ভোলা যায়? তাহা ভুলিলে আমার যে কিছুই থাকে না। আমি ভিখারী ... মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি কিন্তু আমার শেষ সম্বল-ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্বস্ব হরণ করিও না। ···· আমার ভাষা কাড়িয়া লইয়া আমাকে দরিদ্র করিও না। মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায় কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য কে আমাকে উপদেশ দেয়? মাতৃভাষার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ যত দ্রুত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। বিদেশী ভাষার ন্যক্কারজনক অসরলতা ছাড়িয়া মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সহজ ও সরল করিয়া দেশবাসীকে মহত্ত্ব ও জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ কর, দেখিবে কত সহজে সে তোমাকে সাড়া দেয় [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৩২৮ : ১৬]।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সাহিত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, বাঙালি মুসলমানদের যে সব সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাসের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মভাবে লোক-চরিত্র অঙ্কন করতে পারেন—তাঁদের (রচিত) বই পড়া উচিত। ··· মানুষের দৈনিক জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে, তার সুখ-দুঃখের কাহিনী, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, প্রতারণা, উন্নত ধর্মজীবন—এসব উপন্যাসে অঙ্কিত করা হয়। সেসব পুস্তক পাঠ করলে মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা জন্মে [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৫ : ৫৮]।

এভাবে প্রাজ্ঞ মানুষ দ্বারা সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে যখন, তখন সমাজ-জীবনে অবশ্যই জাগৃতির লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য। "জাতি যখন দৃষ্টিসম্পন্ন ও জ্ঞানী হয়, তখন জাগবার জন্য সে কারো আহ্বানের অপেক্ষা করে না, কারণ, জাগরণই তার স্বভাব।" আর বাঙালির সমাজ একেবারে বর্বর-অসংস্কৃত নয়। এদেশে সাহিত্যের কদর হতেই হবে। " যে সমাজে সাহিত্যের কোন আদর নাই, তাহা সাধারণতঃ: বর্বর সমাজ [মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৮৬ : ৭]। বাংলাদেশ বর্বর, অসভ্য, অসংস্কৃত মানবজাতির অধিবাস—একথা স্বীকার না-করলে 'জাগরণ' ও উন্নয়নে অবিশ্বাস করার যুক্তি নেই।

তিন

লুৎফর রহমানের সমকালীন অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকেরা মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে সাহিত্য-সাধনা করে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁদের অনেকেরই সাহিত্য-সাধনায় নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর বাঙালির জাগরণ প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু লুৎফর রহমানের সাধনা ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-নির্বিশেষে সকল মানুষের সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধন। তিনি নির্বিশেষ মানব-কল্যাণের জন্যই লেখনী ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া, এস. ওয়াজেদ আলি, কাজী নজরুল ইসলাম এবং *শিখা*-গোষ্ঠীর লেখক-মনীষীবর্গের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য স্মরণ করা যেতে পারে। বেগম রোকেয়া সমাজের সুষম বিকাশের এবং পূর্ণাঙ্গ-জাগরণের প্রয়োজনে নারী-জাতির উত্থান প্রত্যাশা করতেন এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি নারী জাতিকে সাড়া দানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। *শিখা* গোষ্ঠীর লেখকেরা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং সকল শ্রেণি ও বর্ণের বাঙালির মিলিত সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন বলে অধিকতর পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের বন্ধ্যাত্ব, জড়ত্ব এবং সংকীর্ণতাকে আঘাত করেছিলেন। নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও ঠিক এভাবেই সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে হবে। তবে এইসব লেখকদের মতোই লুৎফর রহমানের সাহিত্য-সাধনার মৌলিক-প্রেরণাও এসেছিলো স্বশ্রেণি ও সমাজের চরম অধ:পতন ও দুর্গতি অবসানের তাগিদ থেকে।

চার

জীবনের প্রতিটি বিষয়কে অবলম্বন করে অভূতপূর্ব যুক্তিশীলতা, স্বদেশহিতের সহানুভূতিতে আর্দ্র দরদী মনের কল্যাণ-ভাবনা দিয়ে ছোট-ছোট সংলাপের আকারে

বৈঠকী ঢং-এ পাঠককে সামনে রেখে যেভাবে সরাসরি কথা বলেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যিক সততা ও গভীর মননশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যদিও তাঁর সব কথার সমান মর্যাদা আজকের দিনে আর নেই। কিন্তু তাঁর ভাষা-বৈশিষ্ট্য কোথাও-কোথাও অতুলনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। বাহুল্য বাক্য শব্দ বা কথা না বলে, কম আয়োজনে দু'চার বা পাঁচ-সাতটি উক্তির দ্বারা তিনি যে অসাধারণ ভাব-সৌন্দর্য এবং সত্য-ভাষণ (বাণী) প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন, সাহিত্যামোদীদের তা চমৎকৃত করে। এখানে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করছি :

১. মাত্র দুটি বাক্যে 'মনুষ্যত্ব' কি—তা ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে: "মনুষ্যত্বকে যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে নাই, তাদের স্বাধীনতা পাবার কোন অধিকার নাই। মনুষ্যত্ব মানব-জীবনের উচ্চাঙ্গের ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. বক্তব্য-প্রধান বাক্যগুলো তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে, কেউ তাঁকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করতে পারেন-এমন সংশয় তিনি আদৌ পোষণ করেন না: "বহু অপদার্থ মানুষ পিতৃভক্তির ভুল অর্থ বুঝে পিতার মনোরঞ্জনের জন্যে পত্নীত্যাগ করে। এদের মত পিতৃদ্রোহী আর নেই। পিতার অসত্যকে বরণ করে অনেক পিতৃভক্ত সন্তান পিতার আদর লাভ করে, এরা সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করলেও এদের মূল্য কম। পুরুষের নিঃসহায় পত্নীর প্রতিও একটা কর্তব্য রয়েছে।

৩. শয়তানের মুখ বীভৎস। কিন্তু শয়তানের বীভৎস রূপের বর্ণনার মাধ্যমে, সদর্থক পবিত্র-সৌন্দর্যের প্রতি তিনি পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারতেন, শয়তানের মুখদর্শনে পাঠকের মনে জিঘাংসার বোধ জাগেনা, বরং সৌন্দর্যের প্রতিই বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হয় তাঁর এই বর্ণনায় : "মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, মোনাফেকের মুখে মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে শয়তানের মুখের সঙ্গে আমার মুখ বদলাতে চাইনে। জগতের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত সৌন্দর্যের সাধ্য নেই শয়তানের কুৎসিৎ মুখচ্ছবি ঢাকে।

এই ভাষা-বৈশিষ্ট্য সমালোচককে মুগ্ধ করেছিলো। *হিতবাদী* পত্রিকার আলোচক তাই লিখেছিলেন : 'বহুকাল এইরূপ সুন্দর পুস্তক (*উন্নত জীবন*) সমালোচনার সুযোগ পাই নাই।" *বঙ্গরত্ন* পত্রিকা লিখেছিল: "সকলের কাছেই গীতার মত, কোরআনের মত ভক্তির অর্ঘ্য পাইবার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার 'উন্নত জীবনের' আছে। বিদ্যুতের ন্যায় বলিবার ভঙ্গী। খরস্রোতা নদীর ন্যায় উদার, প্রশান্ত, ভাব-বিহ্বল! রচনার জড়তা লেশমাত্র নাই।"[৮]

পাঁচ

সাহিত্য ও ভাষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যেমন বাস্তব-জীবনের উদাহরণ ও উপমার উপস্থাপনা করেছেন, তেমনি প্রতিটি বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রদানেরও চেষ্টা করেছেন। যুক্তিবাহুল্য নয়, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন বলে স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় তিনি আশা করেছেন বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠককে অবশ্যই নিজ-মতে আস্থা-স্থাপনে সম্মত করাবেনই। এসব থেকে এবং সমকালের (বিশ শতকের প্রথম চার দশকের) পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে, যা বলতে কোনো দ্বিধা রাখতে ইচ্ছা হয় না, তাহলো: সত্য আবিষ্কার ও তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ-প্রচলনের সচেতন প্রয়াস ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল-উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি বাস্তব কর্মযোগীরূপে যতোদূর পেরেছেন, নিজ-হাতে তা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।[৭]

'নারীশক্তি' ও 'নারী-তীর্থ'-র কথা সবারই জানা। তাঁর রচনাবলিতে পরিস্ফুট এসবের মূল প্রেরণা যা, তা হচ্ছে, মানুষকে সুনীতি দ্বারা চালিত করে 'শুদ্ধ'-পবিত্র রূপে গড়ে তুলতে হবে উন্নত-জাতি ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যাই-ই হোকনা কেন-তাকে সর্বাগ্রে একজন মানুষ হতে হবে। অতঃপর স্বধর্মে বিশ্বাসী একজন ধার্মিক বা আস্তিক হলে কেউ হবে। ভণ্ড অধার্মিক এবং মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী কোনো মানবাকৃতির দানবকে তিনি মানবসমাজে স্বীকার করতে পরান্মুখ ছিলেন। মোটামুটিভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য-অনাহার-অনিদ্রাক্লিষ্ট অবস্থাতেও তিনি সাহিত্য-সেবার দ্বারা মানবজাতির, বিশেষ করে স্বদেশবাসীর কল্যাণ, জাতির উত্থান-অগ্রগতি ও উন্নয়ন কামনা করেছেন। এজন্য বাঙালি জাতি, বিশেষত মুসলিম-সমাজ তাঁর নিকট অশেষ ঋণের দায়ে অবশ্যই আবদ্ধ আছে।[৮]

টীকা

১. *এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী* (আবদুল কাদির সম্পাদিত); পরিশিষ্টে মুদ্রিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখিত প্রবন্ধের উদ্বৃতি, পৃ. ৬৯।

২. *বার্ট্রান্ড* রাসেল এর উক্তিটি উদ্ধৃত, আবুল কাসেম ফজলুল হক অনুবাদিত *বার্ট্রান্ড রাসেল : রাজনৈতিক আদর্শ* পৃ. ৬৭।

৩. পুরাতনদের বিচার অনুযায়ী, নতুনেরাও মহান লেখকদের মহত্ত্ব অনুসরণ না-করে তাঁদের মুরব্বীদের বিরোধিতার মাপকাঠিতেই বিবেচনা করে এসেছেন। নতুনভাবে

বিচার-বিশ্লেষণ করে 'অতীতের বিতর্কিত নব প্রবর্তকদের' চিন্তাধারার মূল্য অনুধাবনের প্রয়াস এদেশে ক্বচিৎ দেখা যায়। এ-কারণে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতির সুমহান ঐতিহ্য। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চিন্তার নমুনা হারিয়ে গেলে কার ক্ষতি? এটা আমাদের জাতীয় ক্ষতির, ক্ষয়েরই লক্ষণ। যাকে 'অবক্ষয়' বলে—তা এর থেকে আর কতো ভয়াবহ হতে পারে?

৪. আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩); আবদুল হক (১৯১৮-); আহমদ শরীফ (১৯২১-); বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-) প্রমুখ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪-) ও তাঁর *লোকায়ত*-গোষ্ঠীর ভাবুক-কর্মীরা এ-ধারারই উত্তরসূরি।

৫. জাতিকে বাঁচাবার জন্য লেখক *উন্নত জীবন* গ্রন্থে মাতৃভাষার চর্চা ও সাহিত্যসেবার প্রাধান্য-গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

৬. পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান এবং বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত টেক্সটবুক বোর্ড প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলনে মুদ্রিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'সাহিত্য ও জাতীয় উত্থান' প্রবন্ধটি তাঁর প্রকাশিত কোনো বইয়ে মুদ্রিত নেই। উদ্ধৃতিটি উপরোক্ত সংকলন (পৃ. ১৪০) থেকে।

৭. *উন্নত জীবন* শীর্ষক গ্রন্থের 'ভদ্রতা' (পৃ ৬৩)- *উচ্চ-জীবন* গ্রন্থের 'পিতৃ-মাতৃভক্তি' (পৃ. ৬৪) এবং *মানব জীবন* গ্রন্থের 'শয়তান' (পৃ. ১৪) শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য।

৮. 'উন্নত জীবন'-এর পরিশিষ্টে মুদ্রিত উদ্ধৃতিগুলো দ্রষ্টব্য।

৯. কাজে যে লজ্জা নেই, ঔষধ বিক্রি করে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১০. কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পাকিস্তান আন্দোলনকালীন মুসলিম জাগরণের অগ্রনায়ক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান উগ্র ধর্মান্ধদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেও প্রগতিবাদীরাও তাঁকে অনুশীলন করেননি। বাংলাদেশ আমলেও তিনি রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছেন। অবশ্য কি কারণে হয়েছেন, তার কারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন না, বা করেন না। যেমন পারেন না ব্যাখ্যা দিতে প্রগতিবাদীরা যে, তাদের দ্বারা কি কারণে লুৎফর রহমান পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত অপমূল্যায়িত! যাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রসারের এবং 'ঐছলামিক সমাজ-ব্যবস্থার' কথা বলেন, তাঁরাও লুৎফর রহমানের খাঁটি 'ঐছলামিক' ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননা। কারণ লুৎফর রহমানের ধর্মে বা ইসলামে বা তাঁর আল্লার আদেশে কোনো মানুষকে অসম্মান ও অপমান করার কথা নেই; কোনো মানুষ ছোট বা মন্দ নয় তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। তিনি মনে করতেন ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো। অথচ 'সাম্যবাদ' বা প্রগতির কথা যাঁরা প্রচার করেন—তাঁরাও মোহাম্মদ লুৎফর রহমানকে আপন ভাবতে পারেন না। কারণ, তাঁদের চিন্তা ও কর্মে জীবনযাত্রায় ও সাধনায় মেকি ও ফাঁকি আছে। লুৎফর রহমান নৈতিক দিক দিয়ে

অত্যন্ত সচেতন লেখক ছিলেন। তিনি এই মেকি, ভাঁড়ামি ও কৃত্রিমতাকেই ধিক্কার জানিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

অতএব লুৎফর রহমানকে আদর্শ ভাবতে পারেননি বাংলাদেশের মানুষেরা। তাঁর আদর্শ বুঝতে হলে এবং তা প্রচার করার জন্য যে উচ্চ নৈতিক মনোবল ও চারিত্রশক্তির প্রয়োজন হয়-তা জাতির মধ্যে এখন নেই বলেই এই পরিস্থিতি। দুর্নীতির অভিশাপগ্রস্ত এই সমাজে নৈতিকতাবাদী এই লেখকের প্রতি আমাদের এরূপ অনীহা মোটেই রহস্যজনক নয়। তবে নিজেদের জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির স্বার্থেই তাঁর সাহিত্য ও সার্বিক চিন্তাধারার প্রতি আমাদের তাকানো উচিত। তাঁর চিন্তার ব্যাপক চর্চার অবকাশ এখনও বাংলাদেশে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের অবদানের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা ও অবহেলার সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক কারণ খুঁজে বের করলে জাতির চিন্তা-চর্চার মোড় ঘুরতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান
১৯৬৪ — *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা।

আবদুল কাদির (সম্)
১৩৭০ — *এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী*। ঢাকা।

আবুল কসেম ফজলুল হক (অনু)
১৯৮২ — *বার্ট্রান্ড রাসেল : রাজনৈতিক আদর্শ*। ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ
১৯৫৬ — *বাংলার জাগরণ*। কলকাতা।

মুহম্মদ এনামুল হক
১৯৬৮ — *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
১৯৮৫ — *যুবক জীবন*। ঢাকা।
১৯৮৬ — *উন্নত জীবন*। ঢাকা।

১৯৮৬ *মহৎ জীবন*। ঢাকা।

১৯৬২ *উচ্চ জীবন*। ঢাকা।

মানব জীবন। ঢাকা।

১৩২৮ 'উর্দু ও বাংলা সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* বর্ষ ৪ : সংখ্যা১ (বৈশাখ)।